ATHENA, VOLUME VIII, JULY 2024 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 224-232
www.athenajournalcbm.in

বেদভিত্তিক সাম্যবাদ ও শ্রীচৈতন্যদেবের নাম-সংকীর্তন প্রচার: প্রসঙ্গ—বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত'

সঞ্জয়চন্দ্র দাস*

প্রাপ্ত: ২৮.০২.২০২৪ পরিমার্জন:২০.০৫.২০২৪ গৃহীত: ৩.০৬.২০২৪

সারসংক্ষেপ: *বর্তমান সমাজে প্রচলিত সাম্যবাদ তত্ত্বের তুলনায় বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের প্রবর্তিত বেদভিত্তিক সাম্যবাদ তত্ত্বের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনেক গভীর ও ব্যাপক। শাশ্বত, স্বাভাবিক ও সহজাত এই মতবাদ মূলত বিশ্ব-প্রকৃতির অগাধ তত্ত্ব নির্ভর। প্রকৃতির নিয়ম ও ধারা অনুযায়ী চালিত এই মতবাদকে বর্তমান যুগে তিনি সহজ-সরল ভাষায় জনসমক্ষে তুলে ধরেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কর্মজীবনেও এই মতবাদের অস্তিত্ব ছিল বলে তিনি স্বীকার করেন এবং সেই সম্পর্কে সুদৃঢ় মত ব্যক্ত করেন। চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গীয় সমাজ-জীবন ছিল শ্রেণি-বৈষম্যে জর্জরিত এবং অন্ধ-ভক্তি, অন্ধ-বিশ্বাস ও সংস্কারে নিমগ্ন। সেই অধঃপতিত সমাজ-জীবনের চিত্র খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে বৃন্দবন দাসের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে। এমনই এক অসাম্য, সংস্কারাচ্ছন্ন ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ক্রান্তিকালে বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব মধ্যযুগীয় নিদ্রাচ্ছন্ন সমাজের বুকে সাম্যবাদের জোয়ার তুলে নবজাগরণের সূত্রপাত করে— যার অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় প্রেম ও ভক্তি। শ্রীচৈতন্যের সমকালীন এই সময়টাকে তাই ভক্তি-আন্দোলন (Bhakti Movement) নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজ-জীবনে শ্রীচৈতন্যদেবের হরিনাম সংকীর্তনের যে প্রচার, তার মূলে প্রকৃতপক্ষে বেদভিত্তিক সাম্যবাদের উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে বেদভিত্তিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে বাংলার সমাজ-জীবনে এক ব্যাপক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থকে অবলম্বন করে বর্তমান আলোচনায় আমরা সেই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করব।*

সূচক শব্দ: *বেদভিত্তিক সাম্যবাদ, শ্রীচৈতন্যদেব, বালক ব্রহ্মচারী, প্রকৃতিতত্ত্ব, নাম-সংকীর্তন, সমাজ-জীবন।*

*সহকারী অধ্যাপক, পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়, পাণ্ডু, গুয়াহাটি।
e-mail: baulasanjoy21@gmail.com

'বেদভিত্তিক সাম্যবাদ' (Vedaism)[১]—এই পরিভাষাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ। বর্তমান সমাজে প্রচলিত সাম্যবাদ তত্ত্বের তুলনায় এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনেক গভীর ও ব্যাপক। সাম্যবাদ তত্ত্ব নিয়ে এই পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে ব্যাপক চর্চা হলেও 'বেদভিত্তিক সাম্যবাদ' তত্ত্ব ও তার বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগ-কৌশল সম্পর্কে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন। 'বেদভিত্তিক সাম্যবাদ' তত্ত্ব সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এখনও প্রাসঙ্গিক ও চর্চার বিষয় হয়ে উঠেনি। যদিও মার্ক্সবাদী সাম্যবাদ তত্ত্ব নিয়ে পৃথিবীর বুকে এই পর্যন্ত বহু আলোচনা, সমালোচনা হয়েছে; এমনকি, প্রয়োগ-কৌশলের দিক থেকেও এর বাস্তব রূপদানের বহু প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে।

মার্ক্সের *কমিউনিজম্* তত্ত্বের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক— এই উভয় দিক থেকে এর দোষ-গুণ, সফলতা ও ব্যর্থতা, বিশ্বায়নের যুগে এর সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি নিয়ে বহু মতানৈক্য ও বিতর্ক রয়েছে। আমরা এখানে সেই বিতর্কে মনোনিবেশ করতে চাই না। আমরা এখানে এমন একটি সাম্যবাদ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব যা মার্ক্সের *কমিউনিজম্* তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বেই অনাদিকাল থেকে সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যের গভীরেই নিহিত ছিল, তা বর্তমানেও আছে এবং আবহমানকাল ধরেই থাকবে। শাশ্বত, স্বাভাবিক ও সহজাত এই মতবাদ মূলত বিশ্ব-প্রকৃতির অগাধ তত্ত্ব নির্ভর। প্রকৃতির নিয়ম ও ধারা অনুযায়ী চালিত এই মতবাদের নাম— বেদভিত্তিক সাম্যবাদ। বর্তমান যুগে ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ এই মতবাদের গভীর তত্ত্বকে অতি স্পষ্টভাবে সহজ-সরল ভাষায় জনসমক্ষে তুলে ধরেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কর্মজীবনেও এই মতবাদের অস্তিত্ব ছিল বলে তিনি স্বীকার করেন এবং সে সম্পর্কে সুদৃঢ় মত ব্যক্ত করেন। বর্তমান আলোচনায় আমরা দেখানোর চেষ্টা করব মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কর্মজীবন ও দর্শনে এই মতবাদের গুরুত্ব কতটুকু ছিল।

'বেদ' বলতে আমরা যে ঋগ্-সাম-যজুঃ-অথর্ব— এই চতুর্বেদকে নির্দেশ করে থাকি, বালক ব্রহ্মচারীর প্রবর্তিত বেদভিত্তিক সাম্যবাদের 'বেদ' শব্দটি কিন্তু শুধুমাত্র এইসব নামপদ বা বিশেষ্য অর্থে সীমাবদ্ধ না থেকে আরও অনেক গভীরে, মূলত তার ধাতুগত অর্থে মুক্তিলাভ করেছে; যার অর্থ জ্ঞান (সং.বিদ্+অ)। অনন্ত মহাকাশের বুকেই এই অনন্ত জ্ঞানের অস্তিত্ব। অর্থাৎ— " 'বিদ্' ধাতুজাত 'বেদ' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞান অনন্ত বলেই বেদও অনন্ত— 'অনন্তা বৈ বেদাঃ।' "[২] সুতরাং বেদ শুধুমাত্র চারখানা খণ্ডেই সীমাবদ্ধ নয়, তা অনন্ত। বালক ব্রহ্মচারীর তত্ত্বানুযায়ী পরিদৃশ্যমান জীব-জগৎ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তথা মহাশূন্যের মাঝে যে জ্ঞানের অস্তিত্ব; আলো-জল-মাটি-বাতাস ও মহাকাশের বুকে যে জ্ঞান চির-প্রবাহমান, অনাদি-কালের অনন্ত ধ্বনি বা সুরসত্তার মাঝে যে জ্ঞানভাণ্ডার ভরপুর; অনন্ত গতিবাদ যে জ্ঞানের মূল সত্তা—সেই জ্ঞান বা চৈতন্যই হল 'বেদ'। সেই জ্ঞান বা চেতনাকে লক্ষ্য রেখেই বালক ব্রহ্মচারী 'বেদ' শব্দটিকে বহুমাত্রিক অর্থে উন্নীত করেছেন এবং এই বহুমাত্রিক অর্থের উপর ভিত্তি করে যে 'সাম্যবাদ' শব্দটির সংযোজন, সেখানেই গুরুত্বলাভ করেছে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়বস্তু।

বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ যুক্তি-বিজ্ঞান-গণিত ও সুর-নির্ভর বেদভিত্তিক সাম্যবাদ তত্ত্বের যে সুগভীর ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা নানা সময়ে তুলে ধরেছেন, তার একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা আমরা এভাবে নিতে পারি— "সত্যিকারের যে সাম্যবাদ তা হচ্ছে ব্যাপক। সমতা ও প্রসারতার ভিত্তির উপরই এই নীতিবাদ দাঁড়িয়ে আছে।... সাম্যনীতি নূতন কিছু নয়। আবহমানকাল থেকেই প্রকৃতির বুকে সাম্যনীতির ধারা চলে আসছে।... জীবজগতের প্রতিটি জীবের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলো প্রকৃতির সমসুরেই গাঁথা। সবারই ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, হাসি-কান্না আছে। জন্ম-মৃত্যুর বাঁধনে সবাই বাঁধা।... প্রকৃতির এই সাম্যনীতিই তো জীবজগতের মূলনীতি। প্রকৃতি নিজেই সাম্যনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। সাম্যনীতি ও সাম্যবাদ তাই প্রকৃতিজাত, সবারই জন্মগত অধিকার।... প্রকৃতিগত যে সাম্যবাদ, সেটাই হচ্ছে বেদভিত্তিক সাম্যবাদ।... প্রকৃতির গ্রন্থেই আমার বেদ পাঠ।... প্রকৃতির সাম্যনীতিই হোক প্রতিটি মানুষের জীবনের মূল নীতি—এটাই বেদভিত্তিক সাম্যবাদের মূল শিক্ষা।... প্রকৃতির সমবন্টন ও রক্ষণ, পালনের যে নীতি তারই সুর নিয়ে হল বেদ। বেদ অর্থাৎ জ্ঞানই হল সমাজের ভিত্তি। বেদে সকলকে এক হওয়ার কথা বলা হয়েছে,... ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে, হিন্দু-মুসলমানে ভেদ থাকবে না। ধনী-দরিদ্র বলে কোন শ্রেণী থাকবে না।... সকলেই বসুমতীর সন্তান। সবারই তাই সম অধিকার।... প্রকৃতির যা কিছু সম্পদ, প্রয়োজন অনুযায়ী

সবার মাঝে বন্টন করার ফলে সমাজে কারও কোন অভাব থাকবে না, উদ্বৃত্তও থাকবে না। কাউকে তাই অনাহারে থাকতে হবে না।... এই ব্যবস্থায় সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি থাকতে পারবে না। সবাইকে বাধ্যতামূলক খেটে খেতে হবে। তেমনি সমাজে অভাব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে একযোগে লড়াই করতে হবে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাদ্য, শিক্ষাদীক্ষা ও সহজ-সরল জীবন যাপনের পথে যারাই অন্তরায় সৃষ্টি করবে, তারাই দেশদ্রোহী বলে গণ্য হবে। সমাজে কারো ব্যক্তিগত ও একচ্ছত্র আধিপত্য থাকবে না। ব্যক্তির পূজা চলবে না, পূজা হবে ব্যাপ্তির।... এই সাম্যবাদ কারোর ব্যক্তিগত বাদ নয়, জীবজগতের সবার।"[৩] এভাবে আমরা বেদভিত্তিক সাম্যবাদ তত্ত্বের সামান্য পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করেছি; যদিও এই তত্ত্বের আরও বহু মূল্যবান ব্যাখ্যা ও বিষয়বস্তু নানাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতির নিয়মানুসারে ব্যক্তি বিশেষের মন-মানসিকতা, আচরণ তথা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠন থেকে শুরু করে সমষ্টি বিশেষের ঐক্যবদ্ধ শক্তির আধারে ইতিবাচক সমাজ পরিবর্তনের ধারা ও আত্মরক্ষার বিপ্লব, আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়বস্তু, এমনকি পরিবেশ-পরিস্থিতিতন্ত্র, আধ্যাত্মিকতা তথা জীব-জগতের সৃষ্টি ও ধারা, সর্বোপরি প্রকৃতির নিয়ম ও ধারার মধ্যেই এই তত্ত্বের বিস্তৃতি। সুতরাং সাম্যবাদের তত্ত্ব-নির্ভর উল্লিখিত এই বিষয়গুলোকে দুটি স্পষ্ট ধারায় ভাগ করেছেন বালক ঠাকুর—"বেদের দুটি ধারা।... একটা হল বাস্তব জীবনের চলার ধারা, আর একটা হল, তারপরে আর কী করতে হবে, সেই ধারা—যেটাকে বলে মুক্তির পথ।"[৪] বাস্তবতার ধারা বেয়ে এই 'মুক্তির পথ' ক্রমশ আধ্যাত্মিকতার ধারায় পর্যবসিত।

বেদের এই দুটি ধারার মধ্যে প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল—বাস্তবতার ধারা অনুসরণ করে বাস্তব সমস্যা সমাধানের পথে প্রথমে এগিয়ে চলা। এই বাস্তবতার ধারাকেই বালক ঠাকুর সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এই *বেদভিত্তিক সাম্যবাদ ও শ্রীচৈতন্যদেবের নাম-সংকীর্তন প্রচার : প্রসঙ্গ—বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত'* ধারাতেই সর্বাগ্রে পথ চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন—"বেদের কথা হ'লো—বাস্তব সমস্যা সমাধানের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান আপনিই হয়ে যাবে।"[৫] তাই আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে তিনি সাময়িক 'প্রবেশ নিষেধ' বসিয়ে দিয়ে বাস্তবধারায় সমাজ-মুক্তির বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন।[৬] তাই কোনও কাল্পনিক স্বর্গের পথ প্রশস্ত না করে এই মর্ত্যভূমিকেই সুন্দর ও সমতার দৃষ্টিতে সাজানোই হল বেদভিত্তিক সাম্যবাদের বাস্তবধারার কাজ। সুতরাং কাল্পনিক স্বর্গের তুলনায় মর্ত্যপ্রীতি ও মর্ত্যসত্তার প্রেম-প্রীতি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসার বন্ধনে প্রকৃতির নিয়ম-নির্ভর সমমর্যাদায় বেঁচে থাকাটাই হল বেদভিত্তিক সাম্যবাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায়ও কাল্পনিক স্বর্গ কিংবা নরকের ঊর্ধ্বে মর্ত্যপ্রীতিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই ঋগ্বেদের মন্ত্রে আমরা এই মর্ত্যপ্রীতির দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করি—

"যত্রে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে॥
যত্তে দিবং যৎপৃথিবীং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে॥"[৭]

অর্থাৎ—

"তোমার যে-মন উধাও সুদূরে
বৈবস্বত যমে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে বর্তে।
তোমার যে মন সুদূরে উধাও
দ্যুলোকে পৃথিবীলোকে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে বর্তে॥"[৮] (১০/৫৮/১-২)

মর্ত্যের প্রতি এই তীব্র আকর্ষণ ও প্রেমই একটা সম-অধিকারে পূর্ণ শ্রেণি-বৈষম্যহীন সর্বাঙ্গ সুন্দর সমাজ গঠনের তাগিদকে তরান্বিত করে তোলে। তাই বেদের বহু স্থানে বাস্তবধারার সামাজিক চিত্রের দৃষ্টান্ত মিলে, যা বেদভিত্তিক সাম্যবাদের বাস্তব-ধারার ইঙ্গিত বহন করে। আজকের বিশ্ব-মানবতাবাদের তত্ত্বটাও বেদের বাস্তবধারায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মানবতাবাদের আদর্শে সমাজ-মুক্তিই হল বেদের বাস্তব-ধারার মূল বিষয়বস্তু।

শ্রীচৈতন্যদেবের কর্মজীবন ও দর্শন সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা বেদভিত্তিক সাম্যবাদের বাস্তবধারার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অনেক বিষয়বস্তু উদ্ধার করতে সক্ষম হব। শ্রীচৈতন্যের কর্মজীবনে বেদভিত্তিক সাম্যবাদের মর্মার্থ উদ্ধার করতে হলে আমাদের তৎকালীন সমাজ-জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে কিছটা ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন। চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গীয় সমাজ-জীবন ছিল শ্রেণি-বৈষম্যে জর্জরিত অন্ধ-ভক্তি, বিশ্বাস ও সংস্কারে নিমগ্ন। অধঃপতিত সমাজ-জীবনের চিত্র খুব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে বৃন্দবন দাসের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের আদিখণ্ডে—

" 'ধর্মকর্ম' লোক, সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥"[৯]

বৃন্দাবন দাসের অঙ্কিত সংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মান্ধ ও অধঃপতিত সমাজ-জীবনের কারণ খুঁজতে গেলে আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে আরও পূর্ববর্তী ইতিহাসে।

সম্রাট অশোকের কাল থেকে প্রাক্-গুপ্ত যুগ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের জোয়ার প্রবল আকার ধারণ করলে তাকে প্রতিহত করার জন্য যে আর্য, অনার্য ও ব্রাত্যধর্মের সমন্বয়ে পৌরাণিক ধর্মের উদ্ভব হল, সেই সমন্বয়ের মূলে সাধারণত কোনও আর্থ-সামাজিক অশুভ শক্তি কিংবা শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা কার্যকরী হয়নি, বরং সেখানে তথাকথিত ধর্মীয় সংস্কার রক্ষার তাগিদটাই বড়ো হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শক্তির অস্তিত্ব ও সংস্কারকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে এই সমন্বয় সংঘটিত হয়েছিল।

সম্রাট অশোকের কাল থেকে প্রাক্-গুপ্ত যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের জোয়ার প্রবল আকার ধারণ করলে তাকে প্রতিহত করার জন্য আর্য, অনার্য ও ব্রাত্যধর্মের সমন্বয় সাধনের মূলে যে উদ্দেশ্য লুকিয়েছিল, ঠিক একই রকম উদ্দেশ্য সাধিত হল তুর্কী বিজয়ের পরবর্তী বঙ্গদেশে। অর্থাৎ জাত-পাত বর্ণ-বৈষম্য ভুলে ইসলাম ধর্মীয় শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জনের পরিবর্তে বাঙালিরা অনুভব করল পুনঃ ধর্মীয় সংস্কার রক্ষার তাগিদ। সুতরাং বঙ্গদেশে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের সমন্বয় সাধনে পুনঃ নতুন এক ধর্মীয় সংস্কৃতির জন্ম হল এবং স্বাভাবিকভাবেই নতুন ধর্মীয় উন্মাদনায় সংস্কারটাই তখন বড়ো হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে মুসলমান শাসনের অনুকূল পরিস্থিতিতে ধর্মকর্ম বলতে তখন জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান, কিছু বিধি-বিধান ও আচার-উপাচারকেই নির্দেশ করা হল—

"বাসুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যজ্ঞ (পাঠান্তর—যক্ষ) পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল॥"[১০]

বঙ্গদেশে নতুন ধর্মীয় সংস্কৃতির পটভূমিতেও ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য বজায় ছিল। তবে প্রকৃত জ্ঞানচর্চার চেয়েও যেখানে আচার-সংস্কারটাই বড়ো হয়ে ওঠে, সেই সমাজে ব্রাহ্মণদের নিরস শাস্ত্রজ্ঞানের ফাঁকা দম্ভ, সংস্কার ও অযথা নিন্দা-সমালোচনা যে বড়ো হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। তৎকালীন অন্তঃসারশূন্য ব্রাহ্মণ্যশ্রেণির অবস্থানের কথা এখানে তুলে ধরা হল—

"যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব॥...
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সভার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥"[১১]

কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্যকে গুরুত্ব দিয়ে কবি বৃন্দাবন দাস এই পঙ্‌ক্তিগুলি রচনা করলেও তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। জীব-জগতের কল্যাণের কথা না ভেবে কিংবা প্রকৃত জ্ঞানের চর্চা না করে নিরস শাস্ত্রচর্চার ব্যর্থ প্রয়াস ও দম্ভের অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্রাহ্মণ্য সমাজের বাস্তবচিত্র এখানে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী বঙ্গদেশে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের যে সমন্বয় সাধন হয়েছিল তাতে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হলেও আর্থ-সামাজিক দিক থেকে শ্রেণিবৈষম্যজাত সমস্যাগুলির আমূল পরিবর্তন সম্ভব হল না। এমনই এক অসাম্য, সংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ক্রান্তিকালে বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব মধ্যযুগীয় নিদ্রাচ্ছন্ন সমাজের বুকে সাম্যবাদের জোয়ার তুলে নবজাগরণের সূত্রপাত করে। যার অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় প্রেম ও ভক্তি। শ্রীচৈতন্যের সমকালীন এই সময়টাকে তাই ভক্তি-আন্দোলন (Bhakti Movement) নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। বঙ্গদেশের শ্রীচৈতন্যদেব ছাড়া মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের অন্যান্য মহাপুরুষগণও ভক্তি-আন্দোলনের ভাবধারায় নিমজ্জিত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতের রামানুজ ও রামানন্দ, উত্তর ভারতের কবীর ও নানক, উত্তর-পূর্ব ভারতের শ্রীমন্ত শংকরদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রত্যেকেরই কর্মজীবন ও ভাবধারার সঙ্গে বেদভিত্তিক সাম্যবাদের যথেষ্ট মিল রয়েছে।

বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি-আন্দোলনের মূলে তথাকথিত ধর্মীয় আচার-সংস্কার, তথাকথিত শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান তথা বিশ্বাস নিহিত ছিল না, এই আন্দোলনের মূলে ছিল প্রকৃতির মতবাদ তথা বেদভিত্তিক সাম্যবাদের তত্ত্ব। তাই প্রকৃতির সহজাত প্রবৃত্তি প্রেমই এই আন্দোলনের মূল পরাকাষ্ঠা। সুতরাং রাগানুগা ভক্তিই এই আন্দোলনে কার্যকরী হয়েছে, শাস্ত্রীয় বৈধী ভক্তির স্থান সেখানে নেই।

শ্রীচৈতন্যদেবের কর্মজীবনে বেদভিত্তিক সাম্যবাদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক কার্যকারিতার প্রয়োজন ছিল। কারণ উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনে আমরা সামাজিক সমন্বয়ের যে চিত্র দেখেছি, সেখানে সাম্যবাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিহিত ছিল না। বরং সেখানে ছিল ধর্মের নামে সংস্কারের বাড়াবাড়ি, ব্রাহ্মণ্যশক্তির অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব রক্ষার স্বার্থ, সর্বোপরি শ্রেণি-বৈষম্যের রূপান্তর চিত্র। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব মধ্যযুগে যে প্রেম ও ভক্তির বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, তার মূলে কোনও ধর্মীয় সংস্কার কিংবা বিশেষ ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় সমষ্টির স্বার্থ লুকিয়েছিল না—প্রকৃতপক্ষে সেখানে কার্যকরী হয়েছে সমাজ ও ব্যাপ্তির স্বার্থ, যা বেদভিত্তিক সাম্যবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সংস্কার ও ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে সমাজ ও জীবজগতের স্বাভাবিক স্বার্থে যেখানে প্রকৃতিজাত সমনীতির প্রয়োগ হয়, সেখানেই বেদভিত্তিক সাম্যবাদ সার্থকতা লাভ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আসলে সেই সাম্যবাদই সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তবে বেদভিত্তিক সাম্যবাদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক কার্যকারিতার জন্য শ্রীচৈতন্যদেবকে এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছিল, তা হল—সংস্কারের আশ্রয় নিয়ে সংস্কার ভাঙার পদ্ধতি। সেই সম্পর্কে বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ বলেছেন—"মহাপ্রভু নিজেই ছিলেন বেদের পূজারী। বেদের একধর্ম একনীতি তিনি জানতেন। সম-অধিকারের কথা, সাম্যবাদের কথা তিনিও বলেছেন, কিন্তু অন্যভাবে। যখন মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল, তখন দেশ ধর্মব্যবসায়ীদের চক্রান্তে সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন—সমাজকে এই মোহাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায়? তিনি যদি জ্ঞানের কথা, বেদের কথা বোঝাতে চান, তবে কেউ তা শুনবে না। এ কথা বুঝেই তিনি অন্যপথ ধরলেন।... তাই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো সংস্কারের ফ্লেগ উত্তোলন করেই অগ্রসর হলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, সবাইকে একত্রিত করলেন, দ্বারে দ্বারে কীর্তন প্রচার করলেন—... উদ্দেশ্য বেদের সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।"[১২] বালক ব্রহ্মচারীর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে মহাপ্রভু সংস্কারের আশ্রয় নিয়েছিলেন এক বিরাট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে।

এই সংস্কার গ্রহণের মধ্যে ছিল এক বিরাট অর্থবোধ। সরাসরি বাস্তবধারার পথ দেখাতে গেলে যেহেতু ভাব-কল্পনা-উচ্ছ্বাসে নিমগ্ন সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ তা গ্রহণ করবে না, সেকথা মাথায় রেখেই মহাপ্রভুকে প্রথমে সংস্কারের পোশাক পরতে হয়েছিল। কিন্তু সেই সংস্কার তাঁর লক্ষ্য ছিল না, তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সংস্কারের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সংস্কার-মুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং বাস্তব-ধারার পথে বেদভিত্তিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা।

মহাপ্রভুর জীবন ও দর্শনে বেদভিত্তিক সাম্যবাদের বাস্তবধারার বহু ইঙ্গিত ও দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। প্রকৃতির নিয়ম ও ধারায় কেউ ছোটো কিংবা বড়ো নয়, প্রকৃতি থেকে দেওয়া যার যার বিশেষ ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেকেই সমান এবং প্রত্যেকেরই সমাজ ও প্রকৃতির প্রতি রয়েছে সমান দায়বদ্ধতা। কিন্তু সেই সমমর্যদা ও দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করে যারা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ খণ্ড খণ্ড জাতি-ধর্ম-বর্ণ তথা আর্থ-সামাজিক নানা শ্রেণি- বৈষম্যের সৃষ্টি করে স্বার্থচালিত নানান বিধি-নিষেধ তথা অনুশাসন তৈরি করেছে, তার বিরুদ্ধে প্রকৃতির সমসুরে সকলকে একযোগে সমতার বন্ধনে সংঘটিত করার উদ্দেশ্যেই নাম-সংকীর্তনের ব্যবস্থা—

" 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥...

ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সভার।
সর্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর।
দশ পাঁচ মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্তন করহ সভে হাথে তালি দিয়া॥' "[১৩]

ভাব-কল্পনা-উচ্ছ্বাসে নিমগ্ন সমাজ যখন অহং-সর্বস্ব ধর্মাচরণ ও কাল্পনিক সিদ্ধিমুক্তির মোহমায়ায় আচ্ছন্ন, সমাজ যখন বৈষম্যমূলক নানান সংস্কার ও বিধি-বিধানের সংকীর্ণ ঘেরাটোপে নিমজ্জিত, শ্রীচৈতন্যদেব তখন সর্বসংস্কারমুক্ত মহানামের ব্যবস্থা করে আসল সিদ্ধিমুক্তির পথ দেখালেন। সেই সিদ্ধি-মুক্তি কোনও কাল্পনিক ভাব-লোকে পর্যবসিত নয়, তা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবসম্মত সমাজমুক্তির ধারায় পর্যবসিত, যার পরবর্তী ধারা জীব-জগতের মুক্তিতে পরিসমাপ্ত— এই কথাগুলির বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা রয়েছে, যেখানে লুকিয়ে আছে তার প্রকৃত উত্তর। আসলে সেই নাম-সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু বাকি সব সংকীর্ণ সংস্কারকে চূর্ণ করে সকলকে একযোগে 'মহানামই কেবলম্'-এর মন্ত্রে বেদভিত্তিক সাম্যবাদের পথে প্রথমে সমাজমুক্তির পথ দেখালেন। অর্থাৎ সমাজের উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, জাত-পাত-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সংকীর্ণ সংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে যেদিন মানুষ প্রেম ও সমতার বন্ধনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে সেটাই হবে আসল সিদ্ধি ও মুক্তি। বেদভিত্তিক সাম্যবাদের বাস্তবতার ধারায় এই সিদ্ধি-মুক্তির আসল অর্থটা এভাবে তুলে ধরা হয়েছে— " 'সিদ্ধি' হল সফলতা—কাজের মাধ্যমে আপনিই সফলতা আসবে।... 'মুক্তি'র অর্থ হ'লো— সংস্কারমুক্ত থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করা।"[১৪] সুতরাং সংস্কারমুক্ত মনোভাব নিয়ে মানুষ প্রকৃতির প্রকৃত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে এই নাম-সংকীর্তনের আসল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে এই মহানাম ছিল আসলে প্রকৃতির সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার।

বাস্তব সমস্যা সমাধানের পথে নাম-সংকীর্তনের যে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা, সে সম্পর্কে বলা যায়— "নিজের আত্মোন্নতি (আত্ম-প্রস্তুতি) ও সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য 'ধ্বনি' রূপ একটা অবলম্বনের অত্যন্ত প্রয়োজন। ধ্বনির যে একটা শক্তি আছে, ঐক্যবদ্ধ করার দ্রুত ক্ষমতা রয়েছে— সেই বিজ্ঞানভিত্তিক ও বাস্তবিক প্রমাণ আমাদের হাতেই রয়েছে। যেমন— ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি মুহূর্তে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য, মৃত্যুভয় জয় করে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য একটা মন্ত্রের মতো কাজ দিয়েছিল। প্রকৃতির জগতে বিভিন্ন প্রাণীরাও তাদের নিজস্ব ধ্বনিকে অবলম্বন করে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে, জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যায়।"[১৫] সেই কারণেই বালক ব্রহ্মচারী বলেছেন— "কীর্তন হচ্ছে

মিলন সংগীত।... সকলকে একযোগে যুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই কীর্তন।"[১৬] সুতরাং মহাপ্রভু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ধ্বনির (নাম-সংকীর্তন) ব্যবহার করে সমাজের শ্রেণি-বৈষম্য দূর করতে চেয়েছিলেন, সমতার বন্ধনে সকলকে একযোগে যুক্ত রেখে বিরাট পরিবর্তনের ঢেউ তুলতে চেয়েছিলেন। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে' দেখি—

"চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সঙ্কীর্তন।
ভক্তগণ গায়, নাচে শ্রীশচীনন্দন॥...
একো জাতি লোক যাথে অর্বুদ অর্বুদ।
ইহা সঙ্খ্যা করিবেক কেমন অবুধ॥...
কেহো নাচে গায় কেহো বোলে 'হরি হরি'।
কেহো গড়াগড়ি যায় আপনা পাসরি॥...
কেহো দণ্ডবৎ হয় কাহারো চরণে।
কেহো কোলাকোলি বা করয়ে কারো সনে॥"[১৭]

সকলকে একযোগে যুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই যে কীর্তন, সেই কীর্তন যদি বাস্তবভিত্তিক কর্মধারায় সমাজ-মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে অন্ধ ভক্তি ও বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয় তখন তা বদ্ধমূল সংস্কারের নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে সংস্কারের অপব্যবহারই হল বেদভিত্তিক সাম্যবাদের চরম পরিপন্থি।

বাস্তবতার ধারায় সমাজ-কল্যাণের বৃহৎ অর্থবোধে এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষা হেতু কীর্তনের যে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারিক দিক, সেই সম্পর্কে ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী বলেছেন—"বৃহৎ অর্থবোধে যে নাম, বৃহৎ অর্থবোধে যদি সেই নামকে চিন্তা করা যায়, তখনই আরম্ভ হয় স্পন্দন। তখন ভিতরের স্পন্দনে স্পন্দিত হয় অণু-পরমাণু। আমাদের সমাজে তাই নাম-জপের প্রয়োজনীয়তা আছে। স্পন্দনেই গড়ে ওঠে সব, তাই নামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব আছে,... নামের মাধ্যমে সমাজকে গড়বার চেষ্টা করা হয়েছে, কীর্তনে মনের দিক থেকে যেমন এগিয়ে যাওয়া যায়, চিন্তারও তেমনি প্রসারতা হয়।"[১৮] সুতরাং স্বচ্ছ উদ্দেশ্য নিয়ে সঠিক পথে ধ্বনিকে অবলম্বন করে এগিয়ে গেলে আমাদের মন সুন্দর ও পবিত্র হয়ে উঠবে। কারণ, চঞ্চল মনকে ধীর-স্থির-একনিষ্ঠ করার জন্য ধ্বনির রয়েছে অদ্ভুত ক্ষমতা। ধ্বনি একাগ্রতার দিকে আমাদের মনকে ধরে রাখে। তাই ধ্বনির সাধনায় মন ধীরে ধীরে ধীর-স্থির হতে থাকে। মন ধীর-স্থির হয়ে গেলে তখন তা ধীরে ধীরে সুন্দর ও পবিত্র হতে বাধ্য। সুতরাং সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে ধ্বনির সাধনা করলে ধ্বনিই আমাদের প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেবে সঠিক পথ চলার কর্মধারাকে। সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে ধ্বনির সাধনা করলে সেই ধ্বনিই আমাদের একনিষ্ঠ মনের গভীরে বুঝটা ধরিয়ে দেবে। তাই বিবেকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার জন্য সঠিক পথে ধ্বনির চর্চা একান্ত বাঞ্ছনীয়। নাম-সংকীর্তন স্বরূপ যে ধ্বনির মাহাত্ম্য, সেই সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—

"যে অনন্ত নামের শ্রবণ-সঙ্কীর্তনে।
যে-তে-মতে কেনে নাহি বোলে যে-তে-জনে॥
অশেষ জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে।
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে॥
'শেষ' বই সংসারের গতি নাহি আর।
অনন্তের নামে সর্বজীবের উদ্ধার॥"[১৯]

বেদভিত্তিক সাম্যবাদের বাস্তবভিত্তিক কর্মধারায় এই নাম-সংকীর্তনের দার্শনিক তাৎপর্য ও সমাজ-বাস্তবতার প্রয়োজনীয়তা লক্ষ করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেওয়া ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরকে কেন 'অনন্তের নাম' বলা হয়েছে? বৃন্দাবন দাস কেন এই নাম শ্রবণে 'অশেষ জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে' বলেছেন? এর উত্তর খুঁজতে গেলে বালক ব্রহ্মচারীর ব্যাখ্যা তুলে ধরা বাঞ্ছনীয়—"ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে; হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।' এই নাম উচ্চারণ করে দুবাহু আকাশে বিস্তার করে সকলকে কাছে টেনে নিলেন। উদ্দেশ্য বেদের সাম্যবাদ প্রচার করা।... কৃষ্ণবর্ণ আকাশের বর্ণ—যে বর্ণ খুঁজলে পাওয়া যায় না। অথচ সেই বর্ণ অন্যসকল বর্ণকে হরণ করে নেয়।

কৃষ্ণ ও রাম উভয়েরই কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ তাঁরা আকাশ-স্বরূপ। তাঁরা সবকিছু হরণ করে নিয়ে যান—অর্থাৎ আকাশের মধ্যেই সব কিছু আশ্রয় গ্রহণ করে; এই অনন্ত নীল আকাশেই সমস্ত পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আশ্রয় নিয়েছে। "[২০] সুতরাং মহাকাশ যেমন অনন্ত, তার বর্ণটাও অনন্ত। এই অনন্ত মহাকাশের বুকে অনন্ত কাল ধরে অনন্ত মহাধ্বনি প্রবাহমান। আমরা জানি ব্রহ্মাণ্ডের মূল ধ্বনি হল নাদধ্বনি (ওম্)। আবার ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরের মধ্যেও সেই অনন্তের ধ্বনিই লুকিয়ে রয়েছে। যেমন—হরে কৃষ্ণ (ওঁ) হরে কৃষ্ণ (ওঁ) কৃষ্ণ (ওঁ) কৃষ্ণ (ওঁ) হরে হরে, হরে রাম (ওঁ) হরে রাম(ওঁ) রাম (ওঁ) রাম (ওঁ) হরে হরে। দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতির নিয়মে আমাদের সকলকে একদিন প্রকৃতির বুকেই মিশে যেতে হবে। আমরা না চাইলেও প্রকৃতি যে আমাদের হরণ করে নিয়ে যাবে তা নিশ্চিত। সেদিন কোনও সংস্কারের বন্ধন আমাদের আটকে রাখতে পারবে না। তাই সংস্কারাচ্ছন্ন না হয়ে, বরং সংস্কারমুক্ত মন তৈরি করে প্রকৃতির সাম্য নীতি ও আদর্শকে গ্রহণ করলে আমাদের অশেষ জন্মের সংস্কার-বন্ধন ছিঁড়ে যেতে বাধ্য।

এখন হয়তো অনেকে প্রশ্ন করবেন, 'অনন্তের নামে সর্বজীবের উদ্ধার' কীভাবে সম্ভব? উপরোক্ত প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গত, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমে এই প্রশ্নটির উত্তর না খুঁজে সরাসরি এর উত্তর খুঁজতে গেলে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অনন্তের নামের মাধ্যমে জীব-জগতের মুক্তির বিষয়টি যদি কোনও এক আজগুবি আধ্যাত্মিক চিন্তা কিংবা ভাব-কল্পনা-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে (যা আমাদের বোধগম্য নয়) চিন্তা করা হয়, তবে কিন্তু গোলযোগের সম্ভাবনা প্রবল। ভাব-কল্পনা-উচ্ছ্বাসে কিংবা আধ্যাত্মিক ধারায় আপাতত জীব-জগতের মুক্তি চিন্তা না করে আমরা যদি প্রথমে বেদভিত্তিক সাম্যবাদের প্রাথমিক ধারায় বাস্তব-সম্মত দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় জীব-জগতের মুক্তি চিন্তা করি, তবে দেখব 'অনন্তের নামে সর্বজীবের উদ্ধার' কথাটা কতটা সত্য, সহজবোধ্য ও যুক্তি নির্ভর। বেদভিত্তিক সাম্যবাদের বাস্তব ধারার কথা অনুযায়ী যুক্তি-বিজ্ঞান-গণিত বহির্ভূত প্রচলিত সমস্ত রকমের সংস্কারকে পরিত্যাগ করে সংঘবদ্ধ হওয়ার অন্যতম উপায় স্বরূপ শুধুমাত্র বিজ্ঞান-ভিত্তিক মহাধ্বনিকে অবলম্বন করে (মহানামই কেবলম্) আমরা যদি সামগ্রিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তাহলে দেখব বেদের প্রাথমিক ধারার নিজের

মুক্তি (সংস্কার-মুক্তি) ও সমাজ-মুক্তির কাজ অনেকটাই সফলতার দিকে এগিয়ে গেছে। আজকের ক্ষমতা-লিপ্সু মনুষ্য জাতির (শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে বাদ দিয়ে) চরম ভোগবাদে সমগ্র জৈব-বৈচিত্র্য এক বিপজ্জনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। শোষণ-শাসন ও ভোগবাদের বাড়াবাড়ি একদিকে যেমন সমগ্র মনুষ্য সমাজকে জর্জরিত করে দিয়েছে, অন্যদিকে এর কু-প্রভাব অন্যান্য জীব-কূলের অস্তিত্বকেও বিপন্ন করে তুলেছে। আজকের এই পরিস্থিতির সুরাহা করতে নাম-সংকীর্তনকে অবলম্বন করে সহজেই সংঘবদ্ধ (নাম-সংকীর্তন যেহেতু মিলন সঙ্গীত) হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এই সংঘবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য কী? এই সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য কীর্তন করে সরাসরি বৈকুণ্ঠলাভ বা জন্ম-মৃত্যুর ছক কেটে পরকালের চিন্তা করা নয়। এই সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল—আত্মরক্ষার বিপ্লব তথা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে ক্রমান্বয়ে নাড়ির গতি বুঝে শোষণ-শাসন, ভোগবাদ ও সমস্ত রকম সামাজিক শ্রেণি-বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন তথা প্রতিবাদ ও প্রতিকারে নামা। অবশ্য এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেব নাম-কীর্তনের মাধ্যমে প্রেম ও ভক্তিকে হাতিয়ার করে আন্দোলনে নেমেছিলেন। তাই বলে শোষণ-শাসন ও অন্যায়কে তিনি প্রশ্রয় দেননি। নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে জনবল গড়ে তুলে আত্মরক্ষাকল্পে তিনি প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন—কাজী দলন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়ে বেদের বাস্তব ধারায় নানা পদ্ধতিতে একদিন আত্মরক্ষার বিপ্লব সফল হলে সমাজ-মুক্তির কাজ সফল হবে। সমাজ-মুক্তির এই কাজের ধারায় সম-সুরে সমবেত মহানাম-ধ্বনির চর্চা সকলের মধ্যে গড়ে তুলবে সম ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম মর্যাদাবোধ। এমন অবস্থায় বিশ্ব যখন ভোগবাদের ঊর্ধ্বে শোষণমুক্ত পরিবেশে দুঃচিন্তা-মুক্ত হয়ে সমতার বন্ধনে থেকে খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকবে এবং সহজ-সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, ভোগবাদের অকারণ দাপট তখন আর থাকবে না। আজকের শোষণ-শাসন ও ভোগবাদের চরম সীমায় সমগ্র জৈব-বৈচিত্র্য যে বিপজ্জনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতি-সহ অন্যান্য জীব-কূল যে অস্তিত্বের সংকটের মুখে পড়েছে, স্বাভাবিকভাবেই তখন তার অনেকটাই সুরাহা হয়ে যাবে। বেদের বাস্তবতার ধারায় এর

থেকে বড়ো জীব-জগতের মুক্তি আর কি হতে পারে! সত্যি সত্যি যদি একদিন সমাজের বুকে এমন সফলতার মুখ দেখা, তাহলে সেটা কীভাবে সম্ভব হয়েছে বলতে হবে? হ্যাঁ, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এমন সাফল্য এসেছে বলতে হবে। এই সংঘবদ্ধ কীভাবে হওয়া গেল? হ্যাঁ, সংস্কারমুক্ত (সংস্কারমুক্ত না হলে সংঘবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়) অনাদি বেদের মহাধ্বনিকে (নাম-সংকীর্তন) অবলম্বন করে সংঘবদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়েছে বলতে হবে। সুতরাং সংস্কারমুক্ত মহানামকে অবলম্বন না করলে যেহেতু সাধারণত সংঘবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়; অন্যদিকে, সংঘবদ্ধ না হলে যেহেতু সমাজ-মুক্তির কাজ সম্ভব হতো না এবং সমাজমুক্তির কাজ সম্পন্ন না হলে যেহেতু জীব-জগতের অস্তিত্ব বিলোপ হতো অর্থাৎ জীবের মুক্তি সম্ভব ছিল না, তাই বলতে হয়, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে' উল্লিখিত— 'অনন্তের নামে সর্বজীবের উদ্ধার', এই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য ও যুক্তি-বিজ্ঞান-গণিত নির্ভর। সর্বোপরি প্রকৃতির নিয়ম ও ধারায় একদিন সমস্ত জীবের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই প্রকৃতির

বুকেই সকলে আবার মিশে যেতে হবে। সুতরাং প্রকৃতির নিয়মটাই যেখানে শেষ কথা এবং সেই নিয়মটা যখন সকল জীবের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য, সেখানে প্রকৃতির সমনীতির বিরুদ্ধে গিয়ে যারা শোষণ-শাসন ও শ্রেণি-বৈষম্য সৃষ্টি করে অসাম্যের বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রকৃতির দেওয়া আইন অনুসারে জীব-জগতের কল্যাণ তথা উদ্ধার-কল্পে শ্রীচৈতন্যদেব প্রকৃতির নীতিকেই অবলম্বন করেছেন।

এভাবে বেদভিত্তিক সাম্যবাদের বহু বৈশিষ্ট্য শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও কর্মের মুখ্য অংশ জুড়ে রয়েছে। সমকালীন সংকীর্ণ ধর্মীয় সংস্কার, আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ, বৈষম্য-জর্জরিত সমাজের অন্যায় অনুশাসনের বিরুদ্ধে এই নাম-সংকীর্তনের ব্যবস্থা ছিল শ্রীচৈতন্যের জীবন ও কর্মের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

সূত্র নির্দেশ:

১. মহারাজ, বালক ব্রহ্মচারী, (২০১৫), *তত্ত্বমালা,* বেদ প্রচারক টিম, পৃ. ৫১৫।
২. চক্রবর্তী, অমলেন্দু, (২০১৬), *ভারতীয় সংস্কৃতির আলোকে প্রভাতসঙ্গীত,* আনন্দমার্গ প্রকাশন, পৃ. ২৯।
৩. মহারাজ, বালক ব্রহ্মচারী, (২০১৫), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫০০-৫০১।
৪. মহারাজ, বালক ব্রহ্মচারী, (১৯৯৭), *সন্তানদলের প্রতি নির্দেশ,* বালক ব্রহ্মচারী অর্গানাইজেশন, পৃ. ১৭।
৫. মহারাজ, বালক ব্রহ্মচারী, (২০১৪), *বেদ সূত্রসার,* বেদ প্রচারক টিম, পৃ. ৪৫।
৬. *তদেব,* পৃ. ১৬৯।
৭. দত্ত, রমেশচন্দ্র, (১৩৮৫ বঙ্গাব্দ), (অনু. ও সম্পা.), *ঋগ্বেদ-সংহিতা,* ২য় খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, পৃ. ৫১৬।
৮. ধর্মপাল, গৌরী, (১৯৮১), (অনু. ও সম্পা.), *বেদের কবিতা,* শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির, পৃ. ২৪৩।
৯. ঘোষ, বারিদবরণ (১৯৯৫), (সম্পা.), *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত,* দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১২।
১০. *তদেব,* পৃ. ১২-১৩।
১১. *তদেব,* পৃ. ১২।
১২. মহারাজ, বালক ব্রহ্মচারী, (১৪২২ বঙ্গাব্দ), *ভারতীয় বেদভিত্তিক সাম্যবাদ,* বেদ প্রচারক টিম, পৃ. ৬৭-৬৯।
১৩. ঘোষ, বারিদবরণ (১৯৯৫), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৪৩।
১৪. মহারাজ, বালক ব্রহ্মচারী, (২০১৪), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৬৫।
১৫. দাস, সঞ্জয়চন্দ্র, (২০১৮), *শুধু মহানামের বন্যা নাকি সামগ্রিক বেদের বন্যা?,* সিটি অপসেট, পৃ. ১২-১৩।
১৬. মহারাজ, বালক ব্রহ্মচারী, (২০১৫), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৮৮।
১৭. ঘোষ, বারিদবরণ (১৯৯৫), (সম্পা.), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৪৮-২৫১।
১৮. রায়, পি. কে., (২০১৩), *পরম বিস্ময় বালক ঠাকুর,* বেদ প্রচারক টিম, পৃ. ৩১-৩২।
১৯. ঘোষ, বারিদবরণ (১৯৯৫), (সম্পা.), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫।
২০. মহারাজ, বালক ব্রহ্মচারী, (১৪২২ বঙ্গাব্দ), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৬৮।